রাজাকার সারমেয়

(১)

যুদ্ধ শেষ। তবুও মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ শোনা যায়। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হয়ত এদিকওদিক খেলাধুলা করছে। গুলির আওয়াজ ওরা ঠিকই বুঝতে পারে। শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই আওয়াজ শোনা মাত্রই যে যেখানে থাকুক বাড়ীতে ছুটে এসে মায়ের আঁচলে আশ্রয় নেয়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে- ‘মা ঐযে ঐদিকে গোলাগুলি হচ্ছে’। মা তখন অভয় দিয়ে পিঁড়ি পেতে নিজের কাছে বসিয়ে রাখেন। দীর্ঘ নয়মাস গোলাগুলির আওয়াজ আর আতঙ্কের মাঝে বসবাস করতে করতে মা’ও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এখন আর ভয় পান না। তাছাড়া তিনি ভাল করেই জানতেন যে, দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। এখন আর সেই শয়তানের বাচ্চারা এইদেশে নেই। নিজেদের অধীনে অনুকুল পরিবেশ পেয়ে গুলি ফুটিয়ে হয়ত কেউ কেউ ক্রোধানল রোধ করছে।

‘ মা যুদ্ধতো শেষ। এখন তো মারামারি নেই। তবুও রিমা আপু কাঁদছে কেন ?

সেকান্দার তার মায়ের কাছে জানতে চায়। কিন্তু মা কী জবাব দেবেন? পাঁচ ছয় বছরের অতটুকুন বাচ্চাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে, তার রিমা আপু কেন কাঁদছে। রিমা তার জেঠাতো বোন। তবে আপন নয়। জেঠাতো না বলে পাড়াতো বলাটাই ভাল। রিমার মাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে। এটা বললে হয়ত সে প্রশ্ন করবে- কেন ধরে নিয়ে গেছে ? সেই কেন’র জবাব দেওয়া তার মায়ের পক্ষে বড়ই কঠিন ছিল।

যুদ্ধের সময়ে রিমার বাবা পাকিস্তানী বাহিনীকে সমর্থন করেছিল। ঠিক পাকিস্তানী বাহিনীকে বলা যায় না। না যুদ্ধের পক্ষে, না বিপক্ষে। অর্থাৎ সে ছিল সুযোগ সন্ধানী। সাইজ করার দলে। অত্যাচার, নির্যাতন ও লুটপাটের পক্ষে সে। হবে না কেন ? জন্মের পর থেকেইতো সে ওরকম। সে আসলে ঐ বাড়ীর কেউ নয়। দশ-পনের মাইল দুরে, গ্রামের এক জেলেপাড়া থেকে রহিম উদ্দীন বাগানী দুই-আড়াই বছর বয়সে তাকে দত্তক এনে লালন পালন করেছেন। তার স্ত্রী ছিলেন নিঃসন্তান। কাজেই তার ঘর শুন্য, মন শুন্য। তিনি অগাধ সম্পত্তির মালিক। সবদিক ভেবেই তিনি স্ত্রীর কথায় ছেলেটাকে পালক নিয়েছেন। স্ত্রী আহলাদ করে বলতেন- আমরা দু’জনে ওকে জাল মেরে কুড়িয়ে পেয়েছি তাই তার নাম জলিল।

সম্পদশালী রহিম বাগানীকে এক কথায় বললেই চলে ছোট খাট এক জমিদার। তবে তিনি দুষ্টশোষক ছিলেন না, পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গ্রামের মানুষ তাকে খুব পছন্দ করতো। তিনি সব সময় মাটি ও মানুষের সাথে মিশে থাকতেন। তার কতগুলো সুপারীর বাগান ছিল। ঐ অঞ্চলে একত্রে এতগুলো বাগানের মালিক আর কেউ ছিল না। সেই কারনেই তার নামের সাথে ‘বাগানী’ যোগ হল এবং তার বাড়ীর নাম ‘বাগানী বাড়ী’ হিসাবেই পরিচিত ছিল। শুধু বংশ প্রদীপ না থাকায় তিনি জলিলকে এনে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন।

এতো সম্পত্তি খাবে কে ? তাই জলিলকে আদর দিয়ে মাথায় তুলে রেখেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই জলিল বেহিসাবী চলাফেরা করতো। শুয়ে বসে খেলেও জিন্দেগী পার হয়ে যাবে, ভেবে রহিম বাগানী হয়ত জলিলকে শাসনের মাঝেও রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। লেখাপড়াও করেছে যৎসামান্য, টেনেটুনে প্রাইমারী। তখন অবশ্য শিক্ষা নিয়ে কেউ অতো ভাবেনি।

পালক পিতা জীবিত থাকতেই জলিল তার সব সম্পত্তি পরোক্ষভাবে তদারকি করা শুরু করেছিল। বিশেষ করে বাগানীর স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি প্রচন্ডভাবে একা হয়ে যান। সেই সুযোগে সম্পত্তির পাই টু পাই জলিল তার নখদর্পনে নিতে শুরু করল। স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর পর রহিম বাগানীও পরলোক গমন করেন। তারপর জলিল হয়ে গেল সেই ছোট সাম্রাজের একক অধিপতি। নাম হল জলিল বাগানী।

রহিম বাগানী একজন নিঃসন্দেহে ভাল মানুষ ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে তার মৃত্যুর পর। তিনি তার সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক তার কাজের লোক ও দীর্ঘদিন যাবৎ যারা বর্গাচাষ করেছে সেই চাষীদের নামে লিখে দিয়েছিলেন। সত্তর দশকের কথা। পরবর্তীতে জলিল বাগানী তাদের সেইসব সম্পত্তি পুনরায় জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে তার বর্বরতা ও হিংস্রতা অত্যন্ত নিষ্ঠূরভাবে দেখা গিয়েছিল। সে প্রথমে রাজাকারদের সাথে হাত মিলিয়েছিল এবং পরে কথিত নক্সাল বাহিনীর কমান্ডার হয়েছিল। কাজেই জোরপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল, লুটপাট, নারী ধর্ষন, নারী হরন, খান সেনাদের নারী অর্পন, খুনখারাবী এসবের সাথে সে পুরোপুরি সম্পৃক্ত ছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই সে আত্মগোপন করেছিল। ক্রুদ্ধ মুক্তিবাহিনীরা তাকে ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। শেষে না পেয়ে বাড়ী থেকে তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেল। আত্মসমর্পনের বিনিময়ে তার স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়ার শর্ত দিয়েছিল মুক্তিরা। এমতাবস্থায় তার ছেলেরা মাতৃ উদ্ধারে মাঠে নেমেছিল। বাবার কৃতকর্মের খেশারত দিতে হয়েছিল তার মাকে। হন্যে হয়ে চতুর্দিক খুঁজতে লাগল তারা। ভাইয়েরা তার মাকে নিয়ে আসবে এই প্রত্যাশায় রিমা দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদতেছিল এবং দৃষ্টির সীমানায় যতদুর দেখা গেল রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেকান্দারের মত ছোট ছোট বাচ্চারা তখন রিমার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়াবী দৃষ্টিতে তার বিলাপ প্রলাপ দেখছিল এবং ঘাড় কাঁত করে তার বাপের কৃতকর্মের ফলাফল অনুভব করছিল।

তিনদিনেও ছেলেরা তাদের মাকে উদ্ধার করতে পারেনি। তবে এতটুকু জেনেছিল যে, তাদের মা নিরাপদে আছে। কিডন্যাপারদের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে জলিল বাগানী আত্মসমর্পন করেনি। এমনকি তার কোন হদিসও পাওয়া যায়নি। বিধায় সকলেই মোটামুটি নিশ্চিত ছিল যে, জলিল মারা গেছে। সেই সংবাদের প্রেক্ষিতে অবশেষে চতুর্থদিন বিকেলে মুক্তিবাহিনীরা সসম্মানে তার স্ত্রীকে বাড়ীতে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

মহিলা তিনদিন লাপাত্তা ছিলেন। তাতে জলিল বাগানীর স্ত্রীর প্রতি সমাজের লোকজনের মাঝে কোন ঘৃনা, বিদ্বেষ বা অনীহা দেখা দেয়নি। এ নিয়ে কেউ কখনো কোন অশোভন আচরনও করেনি। কারণ পাকিস্তানী খান সেনারা নয়, বরং যুদ্ধের পরে এই দেশের বীরসেনারা তার দেশদ্রোহী অত্যাচারী স্বামীকে ধরার জন্যে তাকে অপহরন করেছিল এটা সবাই জানতো। তাই সবসময় সবাই তাকে সম্মানের চোখেই দেখেছে। কিন্তু তা সত্বেও ঐ নিষ্কলুষ মহিলা হয়তবা নিজেকে পাপী মনে করে গৃহবন্দী করে রেখেছেন এবং আজ অবধি। নিজ আঙ্গিনার বাহিরে তিনি যান না। বাড়ীতে, পাড়ায় বা প্রতিবেশীদের কোন বিয়ে অনুষ্ঠান বা কেউ মারা গেলে অথবা যে কোন অনুষ্ঠানে বা দাওয়াতে যান না।

(২)

অতঃপর তৎকালীন স্বাধীন সরকার যুদ্ধাপরাধীদের সাধারন ক্ষমা ঘোষনা এবং মুক্তিবাহিনীদের অস্ত্র জমা নেওয়ার পর জলিল বাগানী হঠাৎ একদিন বিজলীর মতো দেখা দিল এবং সুযোগ বুঝে আত্মপ্রকাশ করল।

প্রথম কিছুদিন সতর্ক চলাফেলা বা কিছুটা আতঙ্কে ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে তার কার্যকলাপ মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও পরবর্তিতে একটু একটু করে তার হিংস্রতা পুনরায় বেড়ে যেতে লাগল। সরকারের সাধারন ক্ষমার সুযোগ কাজে লাগিয়ে সে অতি সহজেই গ্রামের সহজ সরল, ধর্মভীরু, আত্মসম্মান পরায়ন, অসহায়, দুর্বল প্রকৃতির লোকজনের উপর তার পেশীশক্তি, অর্থশক্তি, অপশক্তি, কুটবুদ্ধি চালনা শুরু করে দিল। তার সাথে পাঙ্গা লাগে বা চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে এমন লোক ঐ গ্রামে খুব কমই ছিল। ই-য়া বড় বড় ভয়ঙ্কর লাল্‌সে গরুচক্ষু, ভারতের বনদস্যু বীরাপ্পানের মতো গালের উপর পাকানো স্তুপীকৃত মোঁচ, প্রসারিত বুকের ছাতি এবং হাত ছড়িয়ে পাখ্‌না মেলে হাঁটতো। হাঁটার দাপটে কেউই তার সামনে দাঁড়ানোর সাহসই পেতো না। যখন পুকুর থেকে গোসল সেরে আসতো তখন তার ভিজা পায়ে সপ্পলের ক্যাঁত ক্যাঁত আওয়াজ এবং ভেজা লুঙ্গী ছিপে যখন ঝাঁকি মারতো পট্‌টাস’ করে একটা আওয়াজ হতো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে ভয় পেতো। তার গমনাগমনের ধ্বনি শুনতে পেয়ে ছুটে পালাতো এবং চুপিচুপি আড়াল থেকে লুকিয়ে তার যাওয়া দেখতো। যেন সামনে দিয়ে যাচ্ছে কোন এক ভয়ঙ্কর হিংস্র জানোয়ার। জানোয়ারটি অদৃশ্য হলেই আবার বাচ্চাদের হই চই শুরু হতো।

যুদ্ধ থামলেও স্বাধীন দেশে জলিল বাগানীর অত্যাচার থামেনি। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যেমন- মেয়ের বিয়ে, ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ, সংকটাপন্ন গৃহস্থ্যকে আর্থিক সহায়তা অথবা সংসারে অভাব অনটনের মতো দুঃসময়ে মানুষকে প্রয়োজন অনুযায়ী যৎসামান্য টাকা ধার দিতো এবং টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত অলিখিতভাবে ঐ ব্যক্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি নিজের আয়ত্বে রেখে চাষ করার অনুমতি নিতো। অথবা পামপট্টি মেরে সুযোগ বুঝে একটা টিপসই রেখে দিত। কেউই তার দাবার চাল বুঝতে পারতো না। তারপর ঐ সুযোগে নকল কাগজপত্র বানিয়ে জমিজমা নিজের নামে রেকর্ড করে নিতো। পয়সা হলে দেশের সর্বশ্রেনীর প্রসাশন পকেটে চলে আসে’ এই প্রবনতা সেই ইংরেজদের আমল থেকেই এইদেশে হয়ে আসছে। কাজেই জলিল বাগানী সেই পন্থা অবলম্বন করে চার পাঁচ বছরেই নিঃস্ব করে দিল গ্রামের অসংখ্য পরিবার। পরবর্তীতে যা আর কোন ভাবেই আসল মালিককে ফেরত দেওয়া হয়নি।

জোর জুলুম করে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার পর জলিল বাগানী নব্বইয়ের দশকে ইউনিয়ন মেম্বার পদপ্রার্থী হয়ে পর পর দুইবার কৌশল ও পেশীশক্তি খাটিয়ে নির্বাচিত হয়। মেম্বার হয়েও সে তখন চেয়ারম্যানের মতোই দাপট দেখাতো। চেয়ারম্যান ছিল তার অর্থ ও দাপটের কাছে নতশির। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য তার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চেয়ারম্যান হওয়ার আগেই তার কোমর ভেঙ্গে দুর্বল করে দিয়েছিল পরবর্তী প্রজম্মের এক সাহসী গৃহস্থ্য-বাহিনী।

রাজাকারী জোশ্‌ আর গ্রাম্য রাজনীতির দাপটে সে একদিন তার নিজের ছেলের শশুর বাড়ীর সম্পত্তি দখল করতে গেল। ছেলের শশুর পক্ষের আত্নীয়-স্বজন তখন সুযোগ বুঝে তাদের সাত বাপ-বেটাকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিল। এতে তার সেজ ছেলে টেঁটাবিদ্ধ হয়েছিল। বড় শলাযুক্ত টেঁটার দুটো হুক বুকের বাম পিঞ্জরে মারাত্নকভাবে গেঁথে গিয়েছিল। শক্তিতে না পেরে অবশেষে তার বাপ জলিলসহ অন্য ভাইয়েরা জখম হয়ে তাকে ফেলে রেখেই পালিয়ে গেল।

তার অত্যাচারে এলাকার জনগন অতিষ্ট ও বিরক্ত ছিল এটা ঠিক। কিন্তু তবুও মানবিক কারনে এলাকার লোকজন টেঁটাবিদ্ধ অবস্থায় তার সেঝ ছেলেকে হসপিটালে সিপ্ট করে তাদের

বাড়ীতে সংবাদ দিয়েছিল। টেঁটা এতই মারাত্বকভাবে বিদ্ধ হয়েছিল যে, তাকে দুইতিনটা হসপিটাল থেকে ডাক্তাররা রিজেক্ট করে দিয়েছিল। সর্বশেষ জেলা সদর হাসপাতলের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় ঝুঁকিপূর্ন মেজর অপারেশন করে বুক থেকে টেঁটা বের করা হয়েছিল। এর পর থেকে ঐ রাজাকার নক্সালের পাল শারীরিকভাবে আহত হওয়ার সাথে সাথে মানষিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়লো। কিন্তু শয়তানের উৎপাত কি আর থেমে থাকে ? পেশীশক্তির পরিবর্তে সে অতঃপর নুতনভাবে গ্রাম্য চাষীদের উপর কুটবুদ্ধি চালাতে শুরু করলো।

(৩)

স্বাধীনতার তিনযুগ পার হয়ে গেল। সেকান্দার এখন তিন সন্তানের জনক। সেদিন সেকান্দারের ছোট ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। বাড়ী ভর্তি মেহমান। পাড়ার সবাই অনুষ্ঠানে এসেছিল। কিন্তু জলিল বাগানীর স্ত্রী আসেনি। সেকান্দার তার মাকে জিজ্ঞাসা করল- মা, পুবের ঘরের জেঠী আসেনি ?

‘ না আসেননি। - মা জবাব দিলেন।

‘ কেন আসেনি ? যান্ আপনি গিয়ে নিয়ে আসেন।

‘ তিনি আসবেন না। ঘর খালি তাই। ওনার ঘরের বৌ ঝি সবাই এসেছে।

‘ ঠিক আছে। তাহলে উনার খাবার পাঠিয়ে দিন।

‘ আচ্ছা, দেবো।

সংক্ষিপ্ত জবাবে মেনে যাওয়ায় সেকান্দারের মা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এত সহজে সেকান্দারের প্রশ্ন শেষ হওয়ার কথা নয়। সেই ছোটবেলা থেকেই ওর ওই অভ্যাস। অনেক কৌতুহলপ্রিয়। সন্তুষ্টি না আসা পর্যন্ত প্রশ্ন করতেই থাকবে। যদি বলতেন তিনি কারো ঘরে যান না, তাহলে বলতো- কেন যান না। সেই কেন’র উত্তরটা তো ব্যাপক এবং জটিল। আর যদি উত্তরটা দিতেই হতো তাহলে সেই ছোটবেলার ‘রিমা আপু কাঁদছে কেন’ সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটাই দিতে হতো। কিন্তু উত্তরটা এই জামানায় নতুন করে দেওয়াটা সামাজিকভাবে নাযায়েজ বলা চলে। আর ঐ সত্যটা চুপানোর জন্যে তার মাকে কতো যে বাহানা খুঁজতে হয়েছে আল্লাই ভাল জানে। শুধু তার মা’ই নন। সমাজের অন্যসব মা-বাবাও এইসব বিষয় ভুলেও মনে করার চেষ্টা করেন না। যুদ্ধকালীন সেসব স্মৃতি সবাই ভুলে গেছে। ভুলে থাকতে চায়। ভুলিয়ে রাখতে চায় এবং তা সমাজের কল্যাণে, সম্মানের খাতিরে।

যাইহোক, অনুষ্ঠান প্রায় শেষের পথে। রাত তখন দশটার মতো। গ্রামে দশটা মানে অনেক রাত। কিন্তু বিয়ে বাড়ী হিসাবে সময় তেমন বেশী নয়। মেহমান বিদায় দিয়ে বাড়ীর ঝুট-ঝামেলা শেষ করে রাস্তার মাথায় সেকান্দার কালভাটের উপর বসে সিগারেট ফুঁকছিল। লোকজনের আসা যাওয়া হচ্ছে। কথা হচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়লো পুবের ঘরের জেঠীর কথা। তিনি কেন অনুষ্ঠানে এলেন না ? তাকে কখনো ঘরের বাইরে বের হতেও দেখেনি। বাড়ীর মানুষ হিসাবে হয়ত তাদের ঘরে বা আঙ্গিনায় যাওয়া আসার সময় দেখা হয়েছে, নয়ত নয়। সেকান্দার এর চেয়ে বেশী ভাববার প্রয়োজন মনে করেনি।

তার ঠিক দুইসপ্তাহ পর বাড়ীতে কাছারীর সামনে গ্রাম পুলিশ ও গ্রামের লোকজন এসে জমায়েত হয়েছে। সালিশ হবে। সেকান্দারের বাবা সালিশ ডেকেছে। জলিল বাগানীর সাথে একটি জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। তা মীমাংসা করার লক্ষ্যে উক্ত সালিশের আয়োজন।

সেকান্দার এর আগে কখনো জমিজমা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। যা করেছে সব তার বাবাই করেছে। প্রচুর অর্থ জলে ঢেলেছে ঐসব কেইছ মামলা করতে গিয়ে।

জলিল বাগানী সেকান্দারের সরলমনা বোকাসোকা দাদাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, অথবা যে কোন উপায়ে হোক সম্পত্তি সব দখল করে নিয়েছে। সেকান্দারের বাপ-চাচারা তখন ছোট ছিল। কোথা থেকে খাবার আসতো তারা কখনো জানার প্রয়োজন বা চেষ্টাও করেনি এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরেও নয়। তাদের সেই অবহেলার ফলে শুন্য হাতে অপরিকল্পিত উপায়ে পিতা হওয়ার খেসারত বহন করেছিলেন তাদের বৃদ্ধ পিতা। এসব সেকান্দারের জানার কথা ছিল না। তার দাদী প্রায়ই নাতি নাতিনদের সামনে এসব বিষয় ইনিয়ে বিনিয়ে গল্পের মতো করে বলতো। আর ঐ কাহিনী নাতি নাতিনটা শ্রেফ গল্প হিসাবেই শুনেছিল। সত্য হিসাবে কখনোই ভাবেনি। অথবা ঐসব পুনরায় ফেরৎ পাওয়া যেতে পারে তাও কখনো চিন্তা করেনি। যাইহোক দেরিতে হলেও পুর্বপুরুষদের পরম্পরায় সেকান্দারের বাপ-চাচারা শেষ পর্যন্ত কিছু কিছু সম্পত্তি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল।

(৪)

এভাবে চলতে চলতে একদিন শোনা গেল যে, বাগানীর সেজছেলের ক্যান্সার হয়েছে। সংবাদটি গ্রামে সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল। টেঁটাবিদ্ধ বুকে অপারেশনের পর থেকেই সে কোন না কোন রোগে ভুগছিল। তারপর থেকে একটু একটু করে তা ক্যান্সারে পরিনত হয়েছে। ডাক্তাররা পরীক্ষা নিরিক্ষা করে যখন তার ক্যান্সার নিশ্চিত করলো, তখন থেকেই জলিল বাগানী তার চিকিৎসা বন্ধ করে দিল। বলল- বাঁচবে না তো পয়সা খরচ করে কী লাভ ? ছেলের বউকে স্পষ্ট করে বলে দিল- চিকিৎসা করানোর ইচ্ছে হলে বাপের বাড়ির সম্পত্তি বিক্রি করে যেন চিকিৎসা করায়।

শশুরের মুখে ঐ কথা শোনার পর থেকে সেজ বউয়ের চোখে বাঁধভাঙ্গা জোয়ার বইতে থাকে। অসহায় তিন সন্তানের জননী দিনরাত কেঁদে কেঁদে স্বামীর পাশে বসে বসে ঘড়ির কাঁটা ও তার হৃদপিন্ডের প্রতিটি টিক্ গুনতে থাকে। কিন্তু তার কান্নার আওয়াজ দেশদ্রোহী রাজাকার শশুরের কান পর্যন্ত পৌছায় না। শীতল হয়না তার মন। সেজবৌ খোদার কাছে হাত তুলে বিচার চায়। এটা অন্যায়, এটা অবিচার। খোদা, এর কী কোন বিচার হবে না ? অসহায় মায়ের কান্না দেখে তার স্কুল পড়ুয়া মেয়ে কাছে এসে সান্তনা দেয়। মা, কুত্তার নজর সব সময় গু'য়ের দিকেই থাকে। লাওয়ারিশ কুত্তার বিচার করবে কে? ঐ একমাত্র আল্লাই ভরসা।

গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে থাকে মা ও মেয়ে।

AvBqe Avn‡g` `jvj 13.12.07
†mŠw` Avie|
E-mail – **ayubalibd@hotmail.com**